ভূমিকা

অ্যারিস্টটল সাহিত্যকে বলেছেন মানুষ ও তার ক্রিয়ার অনুকরণ। সাহিত্য স্রষ্টার ব্যক্তিজীবনের সঙ্গে সাযুজ্য থাকে তাঁর সৃষ্টসাহিত্যে প্রতিফলিত জীবনদর্শনের। সমকালীন বিভিন্ন জাতীয় ও আন্তর্জাতিক ঘটনা, রাজনৈতিক, আর্থসামাজিক ও সমাজ প্রেক্ষিতের ওপর সাহিত্যিকের জীবন দর্শনের ভিত গড়ে ওঠে। পাশ্চাত্য ভাবধারার প্রভাবে বাঙালী সমাজের ভাবজগৎ ও মনোভঙ্গিতে উনিশ শতকে আসে নবজাগরণ। সেকালে ইউরোপীয় রেনেসাঁসের যুক্তি, বিশ্ব চেতনা, মানবতাবাদ, ফরাসি বিপ্লব-প্রভাবিত সাম্য-মৈত্রী-স্বাধীনতার আদর্শ ও শিল্প ভাবনার বিকাশ ঘটে এদেশে।

বাংলা সাহিত্যের সৃষ্টিকাল থেকে সমগ্র মধ্যযুগ জুড়ে একটি ধর্মীয় ভাবাবেগ সাহিত্যের সিংহ ভাগে বিচরণ করেছিল। মধ্যযুগের সাহিত্য বলতে মনসা, চন্ডী, ধর্ম , শিব- পাবর্তী ; কৃষ্ণ, চৈতন্য প্রভৃতি নানা দেবদেবী মাহাত্ম্য বিষয়ক আখ্যান কাব্যকে বোঝান হত। বাংলা কাব্যসাহিত্যের ধারাকে দৈবিক মাহাত্ম্য থেকে মুক্তি দিলেন কবি ঈশ্বরগুপ্ত। কালের পরিবর্তনে এল আধুনিক যুগ। কাব্য সাহিত্যে রঙ্গলাল-মাইকেল - হেমচন্দ্র - নবীনচন্দ্রের লেখনীতে বিকশিত হল বাংলা মহাকাব্য–ধারা। ক্রমশঃ বিস্তৃত হল বাংলা গীতিকাব্যের ধারা। বাংলা পাঠককে ভিন্ন সুরে কবিতা শোনালেন বিহারীলাল-সুরেন্দ্রনাথ-অক্ষয়কুমার-দেবেন্দ্রনাথ-গোবিন্দচন্দ্র ও মবানকুমারী বসু, গিরীন্দ্রমোহিনী দাসী প্রমূখ কয়েকজন মহিলা কবি। বাংলা সাহিত্যের ধারাকে বিপুল ঐশ্বর্য ভান্ডারে মহিমান্বিত করে তুললেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুব। বাংলা কাব্যের ইতিহাসে মৌলিক প্রতিভার প্রভাবে উজ্জ্বলজ্যোতিষ্কের ন্যায় ভাস্বর হয়ে উঠলেন সত্যেন্দ্রনাথ—করুণানিধান—যতীন্দ্রমোহণ—কুমুদরঞ্জন—কালিদাস—মোহিতলাল— কাজী নজরুল ও যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত প্রমূখ। বাংলা কাব্যের ইতিহাসে ইতিমধ্যে প্রথম মহাযুদ্ধের অভিঘাত আছড়ে পড়েছে। বাঙালীর জীবন, সংস্কৃতি ও সাহিত্যে পরিবর্তনের প্রেরণা উত্তাল হয়ে ওঠে।

বাংলা কাব্য সাহিত্যের এই পরিবর্তনের পারদ চড়িয়েছে ইউরোপীয় সাহিত্য। ইংরেজী কবিতায় আধুনিকতার সূত্রপাতে কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায় ভিক্টোরীয় যুগকে উত্তীর্ণ করে বাংলা সাহিত্যে পালাবদল ঘটাতে সক্ষম হয়েছিলেন। সেকালে রবার্ট ব্রিজেসের "The Poems of Gerard Murder Hopkins"(১৯১৮) ইংরেজী কাব্যে বাংলা পাঠকেরা আধুনিক কবিতার নবনির্মিতি দেখতে পেয়েছিলেন। ইংরেজী সাহিত্যের কবিদের প্রভাবে বাংলা কাব্যসাহিত্যে বিষয় ও আঙ্গিকে পালা বদল

ঘটেছিল। বিংশ শতাব্দীতে ডব্লিউ. বি. ইয়েট্স, টি.এস. এলিয়ট, রুপার্ট ব্রুক, টি.ই. হিউম, এজরা পাউন্ড, সাইডফ্রেড, সাসুন, উইলফ্রেড আউয়েন, ডব্লিউ. এইচ অডেন, সেসিল ডে লিউইস, লুইস ম্যাসেইসি, নিকোলাস মূর, জি. এস. ফ্রেজুর প্রমুখ কবি বাংলা কাব্য সাহিত্যে আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল। এই সময়কালে বিজ্ঞানের নতুন নতুন আবিষ্কারে বুদ্ধিজীবী মহলে নতুন জীবনপ্রত্যয় দেখা যায়। বাংলা কাব্যের ইতিহাসে যুক্ত হয় প্রান্তীয় ও নিম্ন মধ্যবিত্ত মানুষের জীবন। পাল্টে যেতে থাকে মূল্যবোধ। সমাজ, রাজনীতি, অর্থনীতি, দেশাত্মবোধ ও দারিদ্র কাব্যের অপরিহার্য বিষয় হয়ে ওঠে। এই সময়কালে বাংলা কাব্য জগতে আলোক সঞ্চার করেন কবি অজিত দত্ত, বুদ্ধদেব বসু, জীবনানন্দ দাশ, প্রেমেন্দ্র মিত্র, সুধীন্দ্রনাথ দত্ত , বিষ্ণু দে, সুকান্ত ভট্টাচার্য, বিমলচন্দ্র ঘোষ, সমর সেন, সুভাষ মুখোপাধ্যায় প্রমুখ। এঁদের মধ্যে সুভাষ মুখোপাধ্যায় 'পদাতিক' কবি বলে খ্যাত।

উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধ থেকে বাংলার সমাজ-সাহিত্য ও বিদ্বৎজনের মধ্যে সমাজতন্ত্র ও মার্কসীয় প্রভাব পড়তে থাকে। বঙ্কিম সাহিত্যে এর পরিচয় ও প্রভাব ছিল। বঙ্কিমচন্দ্র 'বঙ্গদেশের কৃষক' প্রবন্ধে যে সমাজ সচেতনতার পরিচয় দিয়েছেন তাতে প্রতীয়মান হয় যে তিনি সমাজতন্ত্র সম্পর্কে অবহিত ছিলেন। তিনি 'সাম্য' প্রবন্ধে লিখেছেন— ভূমি এবং মূলধন, যাহার দ্বারা অন্য ধনের উৎপত্তি হইবে, তাহা সামাজিক সর্ব্বলোকের সাধারণ সম্পত্তি হউক। যাহা উৎপন্ন হইবে, তাহা সর্ব্বলোকে সমভাগে বণ্টন করিয়া লউক। ইহাতে বড় লোক ছোট লোক কোন প্রভেদ রহিল না; সকলেই সমান ভাবে পরিশ্রম করিবে। সকলেই সমান ভাগের ধনের অধিকারী। ইহাই প্রকৃত কম্যুনিজম। (বঙ্কিম রচনাবলী, দ্বিতীয় খণ্ড, সাহিত্য সংসদ, প্রথম প্রকাশ, সংশোধিত দ্বাদশ মুদ্রণ ১৪০১, পৃষ্ঠা ৩৩৪)

উনিশ শতকের শেষার্ধে সমাজতন্ত্রে উজ্জীবিত কয়েকজন প্রগতিশীল সচেতন ব্যক্তি বিভিন্ন গ্রন্থ, সংগঠন ও পত্রিকায় দেশের উৎপীড়িত কৃষক, শ্রমিক ও মেহনতি মানুষের প্রতি সহানুভূতিশীল হয়ে ওঠেন। দীনবন্ধু মিত্র (১৮০০-১৮৭০), দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায় (১৮৪৪-১৮৯৮), শিবনাথ শাস্ত্রী (১৮৪৮-১৮৯৮), কৃষ্ণকুমার মিত্র (১৮৫২-১৯৩৬), রামকুমার বিদ্যারত্ন (১৮৬০- ১৯০১) প্রমুখ সাম্রাজ্যবাদী ইংরেজ শাসক ও শোষকদের বর্বর অত্যাচার, শোষণ ও উৎপীড়নের বিরুদ্ধে প্রতিবাদী ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন। ক্রমে বাংলার সমাজ ও সংস্কৃতিতে মার্কসবাদী চেতনার প্রসার ঘটতে থাকে। এ ব্যাপারে উদ্যোগী হয়ে ওঠেন মানবেন্দ্রনাথ রায় (১৮৮৭-১৯৫৪), ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত (১৮৮০-১৯৬১) বীরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় (১৮৮০-১৯৪৩), মুজফ্ফর আহমেদ (১৮৮৯-১৯৭৩) প্রমুখ সমাজতান্ত্রিক

ভাবাদর্শে উদ্বুদ্ধ সংগঠকবৃন্দ। সমাজতন্ত্র ও সাম্যবাদের সমাজ সচেতনতা বিশ শতকের কুড়ির দশকে বাংলা সাহিত্যে একটি বড় পালাবদল ঘটিয়ে ছিল। কাজী নজরুলের বিদ্রোহ-বীণা বেজে উঠেছিল ভারতীয় ঐতিহ্য ও সৌন্দর্য্য চেতনায় আঘাত দিয়ে। এই পালাবদলে ভিন্ন মাত্রা যুক্ত করেছিল কল্লোল (১৯২৩), কালি-কলম (১৯২৬), প্রগতি (১৯২৭), পরিচয় (১৯৩১) ইত্যাদি সাহিত্য পত্রিকা। যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত, মোহিতলাল মজুমদার প্রমুখ লেখকদের স্বতন্ত্র কণ্ঠস্বর শোনা গেল। তরুণ বাঙালী মানসে দেখা দিল মার্কসীয় শ্রেণীচেতনা, শোষিত-বঞ্চিত-মেহনতি মানুষের প্রতি সহানুভূতি ও সমষ্টির আশাবাদ।

বিশ শতকের তিরিশের দশকে বাংলা সাহিত্য একটি বড় বাঁক নিয়েছিল। 'পরিচয়', 'অগ্রণী', 'অরণি', 'ক্রান্তি', 'প্রতিরোধ' প্রভৃতি প্রগতিশীল সাময়িক পত্র-পত্রিকা ছাড়া গোটা তিরিশের দশক জুড়ে প্রকাশিত ও প্রচারিত হয়েছিল মার্কসীয় বিষয়ে বিভিন্ন বই ও পুস্তিকা। এই দশকে অবিভক্ত বাংলার রাজনীতিতে বামপন্থী চেতনার বলিষ্ঠতম প্রকাশ ঘটতে থাকে। এই সময় বাংলা সাহিত্যেও বলিষ্ঠতম প্রকাশ ঘটতে থাকে। ১৯৩০-৩৩ সালে গান্ধীজীর নেতৃত্বে অহিংস সত্যাগ্রহ ও আইন অমান্য আন্দোলন সারা ভারতে নতুন প্রাণোন্মাদনা জাগালেও গান্ধীজী আন্দোলনের অভিমুখ ফিরিয়ে নেওয়ায় দেশবাসীর মনে চরম হতাশা দেখা দেয়। তাঁর নেতৃত্বে যুবসম্প্রদায়ের আস্থায় চিড় ধরে। তরুণদের মনে বামপন্থী ভাবধারার বৈপ্লবিক রাজনীতির উদগ্র কৌতুহল ও আগ্রহ সৃষ্টি করে। জমিদার, মহাজন ও পুঁজিপতিদের শোষণ ও বঞ্চনায় বড় বড় কলকারখানার শ্রমিক, গ্রামের ক্ষেত মজুরদের মনে ক্ষোভ ও অসন্তোষ পুঞ্জীভূত হয়। শহরের কলকারখানায় শ্রমিক ধর্মঘট বিপ্লবের স্ফুলিঙ্গ ছড়িয়ে দেয়। কৃষক-শ্রমিক শ্রেণীর মানুষ ক্রমশঃ জমিদার-মহাজন-ও বর্বর শাসক শ্রেণীর সুদীর্ঘকালের শোষণ-অত্যাচার ও বঞ্চনার বিরুদ্ধে ক্ষোভ প্রকাশের জন্য সংঘবদ্ধ হয়।

১৯২৯-৩০ সালে অর্থনৈতিক সংকটে কৃষকদের চড়াহারে খাজনা প্রদান অসহণীয় হয়ে ওঠে। সারা ভারত জুড়ে মুক্তি সংগ্রাম উত্তাল হয়ে ওঠে। 'যুগান্তর', 'অনুশীলন সমিতি', 'হিন্দুস্তান সোস্যালিস্ট রিপাবলিকান অ্যাসোসিয়েশন' প্রভৃতি সন্ত্রাসবাদী দলের মুক্তি সংগ্রামের কার্যকলাপে শাসক দল শঙ্কিত হয়ে ওঠে। বোম্বাই, পাঞ্জাব, উত্তরপ্রদেশ ও বাংলাদেশ থেকে কমিউনিস্ট আন্দোলনকারীদের গ্রেপ্তার করা হয়। মার্কসীয় ভাবধারা প্রচারক বই-পুস্তক-পত্র-পত্রিকা নিষিদ্ধ করা হয়। এতে মার্কসীয় ভাবধারার প্রতি দেশবাসীর মনে শ্রদ্ধা বেড়ে যায়। দেশ জুড়ে বিক্ষোভ, ধর্মঘট, আন্দোলন, সভা-সমিতি ও সমাজকল্যাণমূলক কাজ দ্রুত গতিতে প্রসারিত হয়। আইন অমান্য আন্দোলন, বয়কট আন্দোলন-সহ সহিংস সন্ত্রাসবাদী আন্দোলনে সারা দেশ উত্তাল হয়ে ওঠে।

তিরিশের দশকের ভারতের রাজনীতি-প্রেক্ষিত বাংলা সাহিত্য-সংস্কৃতিতে আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল। বাংলা সাহিত্য-সংস্কৃতিতে মার্কসীয় চেতনার প্রসার ঘটে। বাংলার প্রতিভাবান তরুণ লেখক ও সাংস্কৃতিক কর্মীবৃন্দ বাংলা প্রগতিশীল সাহিত্য সংস্কৃতি আন্দোলনে যুক্ত হন। এই আন্দোলনে সক্রিয় হয়ে ওঠেন সরোজ দত্ত, অনিল কাঞ্জিলাল, সুবোধ চৌধুরী, বিনয় ঘোষ, সমর সেন, গোপাল হালদার, চিন্মোহন সেহানবীশ প্রমুখ। ১৯৩৬ সালে গড়ে ওঠে 'নিখিল ভারত প্রগতি লেখক সংঘ'। এই সংগঠনের ইস্তাহারে সাহিত্যের নতুন উপাদান হিসেবে চিহ্নিত করা হয় ক্ষুধা; দারিদ্র্য, সামাজিক পরানুখতা, রাজনৈতিক পরাধীনতা প্রভৃতি। সে সময়ে প্রগতি লেখক সংঘের অবস্থান ছিল ফ্যাসিবাদের প্রতিবাদ ও প্রতিরোধে সোচ্চার হয়ে ওঠা। এই সংগঠনের তৎপরতায় উজ্জীবিত হয়ে ১৯৩৬ সালের ২৫ শে জুন গঠিত হয় 'নিখিল বঙ্গ প্রগতি লেখক সংঘ'। এর অন্যতম পৃষ্ঠপোষক ছিলেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। এই সংঘের সঙ্গে সংযুক্ত ছিলেন — নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত, সুরেন্দ্রনাথ গোস্বামী, সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার, হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত, সুধীন্দ্রনাথ দত্ত, আবু সয়ীদ আইয়ুব, বিষ্ণু দে, বুদ্ধদেব বসু, সমর সেন প্রমুখ সাহিত্যিক ও বুদ্ধিজীবী।

বাংলার শিল্পী সাহিত্যিক ও বুদ্ধিজীবী বিদ্বৎজন সমাজে ফ্যাসীবাদের বিরোধিতা তীব্র হয়ে ওঠে। গড়ে ওঠে ফ্যাসিস্ট বিরোধী লেখক ও শিল্পী সংঘ (১৯৪২) নাট্য সাহিত্যে এর প্রভাবে গড়ে ওঠে গণনাট্য আন্দোলন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের অভিঘাত, পঞ্চাশের মন্বন্তর চল্লিশের দশকে শিল্পী সাহিত্যিকদের মনোজগতে দায়বদ্ধতার চেতনা ও দেশকাল সচেতনতা চরমে পৌঁছে দিয়েছিল। শিল্প-সংস্কৃতি এ সময়ে হয়ে ওঠে নিপীড়িত মানুষের জীবন সংগ্রাম ও মানব মুক্তির অন্যতম বিপ্লবী হাতিয়ার। লেখণীকে হাতিয়ার করে এই দশকে সাহিত্য সৃষ্টি করেছিলেন সুকান্ত ভট্টাচার্য, বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, রাম বসু, অসীম রায়, নীরেন্দ্রনাথ রায়, মঙ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যায়, গোপাল হালদার, ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, বিষ্ণু দে, সোমনাথ লাহিড়ী, সরোজ মুখোপাধ্যায়, চিন্মোহন সেহানবীশ, সরোজ দত্ত, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, বিজন ভট্টাচার্য, অয়ন মিত্র, দিনেশ দাশ, সমর সেন, সুভাষ মুখোপাধ্যায়, বিনয় ঘোষ প্রমুখ। এঁদের রচনায় প্রতিফলিত হয়েছে সামজ বাস্তবতা, ও মানবতাবাদী দৃষ্টিভঙ্গি। এঁদের রচনায় বাংলা সাহিত্যে সমাজ-রাজনীতি সচেতন নতুন সাহিত্যাদর্শ গড়ে ওঠে।

এই চেতনার বিকাশে মার্কসীয় ভাবাদর্শ পালন করেছে অগ্রগণ্য ভূমিকা। বাংলা সাহিত্যের নবোত্তর ধারায় অন্যতম শ্রেষ্ঠ রূপকার সুভাষ মুখোপাধ্যায়। তিনি ছিলেন মার্ক্সীয় ভাবাদর্শে 'পার্টিজান' মানুষ। তাঁর ব্যক্তিসত্তার সঙ্গে সম্পৃক্ত তাঁর রাজনীতিসত্তা ও সাহিত্যসত্তা। রাজনীতি তাঁর জীবনবোধের বিশিষ্ট ভঙ্গী। তিনি বলেন — ''পার্টির কর্মসূচী, প্রস্তাব, রণকৌশল, রণনীতি — আমার পাওয়ার উৎস

এসবেরও বাইরে। আমি পেয়েছি দেয়ালে পোস্টার মেরে, অফিসঘর ঝাঁট দিয়ে, মিছিলে গলা মিলিয়ে, কাগজে ডাকটিকিট সেঁটে, ক্ষেত-খামারে, কলকারখানায়, কাজ করা হাতের ছন্দে, বস্তিতে আর কুঁড়ে ঘরে, মাদুরে আর ছেঁড়া কাঁথায় শুয়ে। কমিউনিস্ট পার্টি আমাকে তন্ন তন্ন করে দেখার চোখ দিয়েছে, অন্ধকারে ঝাঁপ দেবার সাহস জুগিয়েছে, লাগসই শব্দ দিয়ে আমার মুখে সচিত্র বোল ফুটিয়েছে।'' (তিনজন আধুনিক কবি সমর সেন সুভাষ মুখোপাধ্যায় সুকান্ত ভট্টাচার্য, মাহবুবুল হক, প্রথম প্রকাশ জানু: ২০০৫, পৃ: ১৮০, নয়া উদ্যোগ, ২০৬ বিধান সরণি, কলকাতা ৬) এই রাজনীতির বিভিন্ন উত্থান পতনে বিভিন্ন সময়ে তাঁর জীবন ও সাহিত্যের পালাবদল ঘটেছে। কর্মজীবনের সঞ্চিত বিভিন্ন অভিজ্ঞতার সঙ্গে রাজনীতির মেলবন্ধনে তাঁর সাহিত্য জীবন গড়ে ওঠে। রাজনীতির সূত্রে অর্জিত দেশ বিদেশের অভিজ্ঞতা তাঁর সাহিত্য বাস্তবতার ভিত নির্মাণ করে দেয় — এই বিষয়টি তাঁর কাব্য-সাহিত্য বিশ্লষণ ও অন্বেষণ করা আমাদের অন্যতম লক্ষ্য।

বিষয়বস্তুর নিরিখে তাঁর লেখনী ছিল বিচিত্র পথগামী। কাব্য, ছড়া, উপন্যাস, অনুবাদ, বিপোর্টাজ ও ভ্রমণকাহিনী, সাহিত্য সমালোচনা বিষয়ক বিভিন্ন গ্রন্থে তাঁর সৃষ্টি প্রতিভার নিদর্শন পাই। রচনার ক্ষেত্রে সুভাষ মুখোপাধ্যায় রাজনীতির সংকীর্ণ গন্ডীজালে আবদ্ধ ছিলেন না। বরং রাজনৈতিক জীবনের অভিজ্ঞতাকে আধার ও বাহন করে সাহিত্যে তার শিল্পরূপ নির্মাণ করেন। রাজনীতি বিষয়ক গল্প-উপন্যাস-কাব্য রচনার ধারায় সুভাষ মুখোপাধ্যায় স্বতন্ত্র। তাঁর সাহিত্য জীবনে পার্টির দ্বিধাবিভক্ত ও নাজিম হিকমত সহ অন্যান্য বিদেশী লেখকদের প্রভাব তাঁর সাহিত্যের পালাবদল ঘটিয়েছে। শুরু থেকে তাঁর 'পদাতিক', 'চিরকূট' ও 'অগ্নিকোণ' কাব্যে শোনা যায় ব্যক্তি মানুষের মুখে ব্যঞ্জিত সমষ্টি মানুষের পদধ্বনি। শোনা যায় ফ্যাসিবাদের আগ্রাসনের বিরুদ্ধে মরণজয়ী প্রতিরোধ গড়ে তোলার আহ্বান, শোনা যায় মন্বন্তর-লাঞ্ছিত স্বদেশ ও জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের প্রত্যয়দৃপ্ত কবিকণ্ঠ। এর পরবর্তী কালের ব্যক্তি জীবনের পট পরিবর্তনে লেখনীতে ঝরে পড়ে মানবিক বিশ্ব রচনার স্বপ্ন প্রত্যয়। অন্তর্লোকে ভাস্বর হয়ে ওঠে সৃজনধর্মী মানবিক চেতনা। অঙ্কিত হয় দৈনন্দিন সাধারণ জীবনের জলছবি। স্পষ্ট হয়ে ওঠে অনাকাঙ্ক্ষিত রাজনৈতিক প্রত্যয় ভঙ্গের ট্র্যাজিক বেদনা।

তাঁর উপন্যাসের সংখ্যা অধিক নয় — পাঁচটি। তাঁর মানসলোকের প্রতিফলন ঘটেছে সে উপন্যাস গুলিতে। উপন্যাসে তাঁর স্বাধীন জীবন-জিজ্ঞাসা নিজস্ব নিয়মে সমকালীন পটভূমিতে বিকাশ লাভ করেছিল। ঔপন্যাসিক সুভাষ উপন্যাসে মার্ক্সকে অবলম্বন করেছিলেন। এজন্য তাঁকে নিন্দিত বা নন্দিত না করে আমরা দেখব সেটাই যা জীবন থেকে তিনি গ্রহণ করেছেন, যে বক্তব্যে পৌঁছতে চেয়েছেন এবং জীবনকে যে দৃষ্টিভঙ্গিতে দেখেছেন। উপন্যাস শিল্পে তাঁর স্বাধীন স্বচ্ছন্দগতি

উপন্যাসগুলির কাঠামো নির্মাণ, চরিত্র সৃজন, ভাষাবয়ন, জীবন ব্যাখ্যা সর্বত্র উপলব্ধি হয়। তিনি যে পদ্ধতিতে জীবনকে দেখেছেন, জীবন থেকে যা গ্রহণ করেছেন তা এক নৈতিক বোধে বিশিষ্ট।

সাংবাদিকতার সূত্রে ও বাংলার ডাকে তিনি চষে বেড়িয়েছিলেন শহর-নগর-গ্রাম ও বন্ধুর পথ। বাংলার মানুষের সুখে-দুঃখে-সংগ্রামে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করে লিখেছেন প্রচুর রির্পোটাজ। তার একাধিক অনুবাদ, ছড়া ও অন্যান্য রচনায় শিল্প প্রতিভা, রচনা বৈচিত্র্য ও শিল্প মানসের পরিচয় মেলে। সুভাষের কাছে সাহিত্যের শিল্পগুণ মূল্যবান, কিন্তু তার থেকে বেশী দামী মনে হয়েছিল জীবনের দাবী। তাঁর রচনায় নিছক ভাবলুতা-প্রেম-ভালোবাসাকে তিনি প্রশ্রয় দেন নি। গদ্যের ভাষা কোথাও কোথাও কাব্যময় হয়ে উঠেছে। তবে কাব্যের ক্ষেত্রে বাড়তি বাগ্‌বহুলতাকে ঝরিয়ে ফেলে তাকে করতে চেয়েছিলেন মেদহীন ও সুঠাম। বিষয়, আঙ্গিক ও ভাববস্তুতে তিনি আত্মোপলব্ধি কতটা স্বতন্ত্র্য ও আধুনিক ছিলেন — সেটি আমরা এই অভিসন্দর্ভে অন্বেষণ ও পর্যালোচনা করব।

রাজনীতি স্বাভাবিক নিয়মে যুগ পরিবর্তন, মত পরিবর্তন, ক্ষমতা পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে মহাকালের নিয়মে বাসি ফুলের মতো মূল্যহীন হয়ে যায়। ঘটনাশ্রয়ী রাজনীতি পাঠককে একাধিক শিবিরে পৃথক করে দেয়। কোনো রাজনৈতিক মতাদর্শের জীবন প্রত্যয়ে সৃষ্ট রচনা বিরোধী শিবিরের পাঠকের মনে জাগায় দলগত বৈষম্য ও বিরোধী মনোভাব। সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের কাব্য-উপন্যাস-রির্পোটাজ ও অন্যান্য রচনাগুলির মূল সুর রাজনীতি। তথাপি বিশেষ গুণে তাঁর রচনা পাঠকের হৃদয়ে অসাধারণ নির্বিরোধ গ্রহণযোগ্যতা আদায় করে নেয়। সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের কাব্যগুলিতে কালের নিয়মে পালাবদল ঘটেছে। বিভিন্ন সময়ে এসেছে জীবনের নানা দিক। জীবন ও জগৎকে দেখার স্বতন্ত্র দৃষ্টি। তাঁর প্রথম জীবনে ঘটেছে রাজনৈতিক কাব্যধারার সূত্রপাত। রাজনীতি স্বাভাবিক নিয়মে যুগ পরিবর্তন, মত পরিবর্তন, ক্ষমতা পরিবর্তনের ফলে মহাকালের নিয়মে বাসি ফুলের মতো মূল্যহীন হয়ে যায়। তাছাড়া ঘটনাশ্রয়ী রাজনীতি পাঠককে একাধিক শিবিরে বিন্যস্ত করে দেয়। বিরোধী শিবিরের পাঠকের মনে জাগায় দলগত বৈষম্য ও বিরোধী মনোভাব। তাই কবিতা সেই বিরোধী ও নিজের দলের মধ্যে সমান অনুভূতি সঞ্চারিত করতে পারে না। কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায় এই রাজনীতি বিষয় নিয়ে কাব্য সৃষ্টি করলেন। তাঁর বিভিন্ন কাব্যের মূল সুর রাজনীতি। কোন্ গুণে তাঁর রাজনীতি নির্ভর কাব্য পাঠকের নির্বিরোধ অসাধারণ গ্রহণযোগ্যতা আদায় করতে সমর্থ — তা এই পর্বের বক্তব্য।

তাঁর বেশীরভাগ কাব্যেই ইতিবাচক ও নেতিবাচক ভঙ্গিতে রাজনীতি এসেছে। এই পর্বে 'পদাতিক', 'চিরকুট' ও 'অগ্নিকোণ' এই তিনটি কাব্যে দেখা যাবে কিভাবে তাঁর কবি-সত্তা রাজনৈতিক সত্তার সঙ্গে শিল্পিতরূপ পেয়েছে। তাঁর হাতে রাজনৈতিক কাব্যধারার সূত্রপাত ও বিকাশের

ইতিবৃত্ত কতটা বাংলা কাব্যধারায় ঐতিহাসিক তা দেখান হবে। তাঁর রাজনৈতিক বলিষ্ঠ আদর্শ বাংলা কাব্যের ধারায় নতুন সুর, ভাষা, আবেগ ও সমাজ সচেতনতা আনতে সমর্থ হয়েছে তা কাব্য তিনটির কবিতাগুলির বিস্তৃত আলোচনায় ধরা পড়বে। রবীন্দ্রনাথের রোমান্টিক যুগের উত্তরকালে বাংলা সমাজ ও সাহিত্যের পটভূমিতে তা বিচার্য বিষয়।

তাঁর প্রথম কাব্যেই ('পদাতিক') আলোড়ন সৃষ্টি হয়েছে কাব্য-জগতে। বাংলা কাব্যের ধারায় নজরুলের ভাববাদী সাম্যবাদের পর এই প্রথম একটি কাব্য, যাতে এই প্রথম একজন বাঙালী কবি রাজনৈতিক দলের মত পুরোপুরি মেনে নিয়ে একটি দলের প্রতিনিধিত্ব করে কাব্য লিখলেন। এ কাব্যে দেখা গেল কবির বলিষ্ঠ রাজনৈতিক আদর্শ ব্যক্তিকে বাদ দিয়ে সমষ্টি মানুষকে কাব্য শিল্পে উত্তীর্ণ করেছে। এ কাব্যে ব্যক্তির মধ্যে ব্যঞ্জিত হয়ে ওঠে সমষ্টি মানুষের সম্মিলিত ঘর। তিল তিল মরণেও উদ্বেল জীবন-প্রীতি, হাতুড়ি ও কাস্তের গান। লাল পতাকা হাতে নতুন আশার উদ্দীপনায় সমষ্টি মানুষের রাজনীতি সচেতনতা নিয়ে এল 'পদাতিক'— তির্যক ব্যঙ্গে, প্রবাদের ব্যবহারে, বাংলা ইডিয়মের প্রয়োগে, গদ্যধর্মী শব্দ ব্যবহারে। সংলাপের হালকাচালে, হসন্তের নতুনত্বে, গতির সুকৌশল প্রয়োগে রাজনৈতিক মতাদর্শ 'পদাতিক'-এ গতি দান করেছে — এই বিষয়টি আমরা অভিসন্দর্ভের দ্বিতীয় অধ্যায়ে পর্যালোচনা করেছি ।

তাঁর বিশিষ্ট জীবন বোধের পরিচায়ক হল 'চিরকুট' ও 'অগ্নিকোণ'। কবি রাজনীতিতে আপাতমস্তক ডুবে থেকে রচনা করেন 'অগ্নিকোণ'। এই কাব্যের কবিতাগুলিতে রয়েছে রাজনীতির উগ্রতা। একজন রাজনৈতিক কর্মীর সক্রিয়তা কবিতায় প্রত্যক্ষ হয়ে দেখা দিয়েছে। কাব্যে এসেছে মিছিলের শ্লোগান। মিছিলের মুষ্টিবদ্ধ হাত, মিছিলের পদধ্বনি, বাম-আন্দোলনের চরমপন্থা সদর্থক ও সার্থকভাবে অগ্নিকোণে শিল্পিত হয়ে উঠেছে। দুনিয়া বদলে দেবার প্রত্যয় ধ্বনিত 'চিরকুট' কাব্যে। অসংযত সংযম নিয়ে রাজনৈতিক মতাদর্শ, দলের নির্দেশ ও পথ দেখার চেষ্টা রয়েছে এই কাব্যে। 'পদাতিক'-এ শাণিত ধার, তীর্যক ব্যঙ্গ 'চিরকুট'-এ এসে ইতিবাচক সুরে ধ্বনিত হয়েছে। রাজনৈতিক বিশ্বাস স্থির লক্ষে উপনীত হয়েছে। রাজনৈতিক ভাবনার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে দেশপ্রেম, আত্মোপলব্ধি ও আন্তর্জাতিকতাবোধ — এই বিষয়টিকেও আমরা তাঁর কাব্য-সাহিত্যে পর্যালোচনা করেছি ।

কাব্যকে হাতিয়ার করে কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায় বিশ্বব্যাপী ফ্যাসীবাদ-বিরোধী আন্দোলনের ভীত দৃঢ় করেছিলেন। তিনি ফ্যাসিষ্ট বিরোধী লেখক ও শিল্পী সংঘের যুগ্ম সম্পাদক হিসেবে নির্বাচিত হন ১৯৪২ সালের ২৮শে মার্চ। এ-বছরই তিনি জুলাই মাসে 'জনযুদ্ধের গান' শীর্ষক একটি গীত সংকলন করেন প্রকাশক হিসেবে। 'চিরকুট' ও অন্যান্য কাব্যের যেসব কবিতায় ফ্যাসিবাদের

আগ্রাসনের বিরুদ্ধে মরণজয়ী প্রতিরোধ গড়ে তোলার আহ্বান জানিয়েছেন তা এই পর্বে বিস্তৃত আলোচনা করা হবে। তাঁর কবিতায় জাপানী ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে চীনের মুক্তি আন্দোলনের সমর্থন করেছিলেন। কবিতায় তিনি ফ্যাসীবাদ ও সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ ও সংগ্রাম বলিষ্ঠ কণ্ঠে ধ্বনিত করেছেন। বিশ্বব্যাপী ফ্যাসীবাদ প্রতিরোধ গড়ে তোলার কথায় তিনি কাব্যে ভারতের জনগণের প্রতিনিধিত্ব করেন।

তাঁর কাব্যে ধরা পড়েছে মন্বন্তর লাঞ্ছিত স্বদেশ ও জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের চেতনা। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সংকটপূর্ণ দিনে পঞ্চাশের মন্বন্তর বাংলার জনজীবনে চরম আঘাত এনেছিল। সুভাষ মুখোপাধ্যায় সাংবাদিকতা সূত্রে সেই মন্বন্তরের ভয়াবহ ছবি প্রত্যক্ষ করেছিলেন। সেদিনের মন্বন্তর তাঁর কবিতার ভাববস্তু ও প্রকরণে লক্ষণীয় পরিবর্তন এনেছিল। কবি দুর্ভিক্ষের নিছক ছবি অঙ্কন করতে কবিতা লেখেন নি। তাঁর কবিতায় অঙ্কিত দুর্ভিক্ষের ছবিতে ফুটে উঠেছিল স্বদেশবাসীর মর্মান্তিক দুরবস্থার প্রতি উদ্বেগ উৎকর্ণ সমবেদনা ও শোষকদের বিরুদ্ধে ক্ষোভ ও ঘৃণা এই সংকটের প্রতিরোধ ও জাতীয় মুক্তির কামনায় তাঁর কবিতায় দৃঢ় সংকল্প ও আশাবাদ ধ্বনিত হয়েছে। তাঁর পদাতিক, চিরকুট ও অন্যান্য কাব্যের কবিতাগুলিতে কোথায় কোথায় মন্বন্তর-এর প্রতিরোধ, শাসক-শোষকদের অপশাসন থেকে জাতীয় মুক্তি ব্যঞ্জিত হয়েছে তা এই পর্বে অন্বেষণ করা হয়েছে।

কালের গতিতে তাঁর কাব্যে উচ্চকিত কণ্ঠে দৃপ্ত হয়ে ওঠে মানবিক চেতনা। এই পর্বে আলোচনা করা হবে সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের কাব্য ধারার এক বিশেষ পালাবদল। 'অগ্নিকোণ-এ পর 'ফুল ফুটুক' কাব্যগ্রন্থ থেকে তাঁর কাব্যমানস নতুন মোড় নিয়েছে। এতে উদ্দীপক হিসেবে প্রতিক্রিয়া করেছে হিকমতের ও মায়াকোভস্কির কবিতা। এই পর্বে তিনি রাজনৈতিক দলমতের কষ্টিপাথরে বিশ্বসংসারকে বিচারের প্রবণতা অতিক্রম করে নিটোল পরিপূর্ণ মানবতাবাদে আত্মস্থ হয়েছেন। এই পর্বে তিনি মানবতাবিরোধী অশুভ শক্তির পতন এবং ভালবাসা প্রত্যয় পূর্ণ মানবিক বিশ্ব রচনার দৃষ্টিকোণে কাব্য সৃষ্টি করেছেন। এই পর্বের কাব্যে এসেছে বৈনাশিক স্যাটায়ারের জায়গায় কবির আত্মস্থ ইতিবাচক মানবিকতায়। এই পর্বের কাব্যে এসেছে অভিনব আঙ্গিক, অভিনব চিত্রকল্প এবং বিভিন্ন বিষয়ের বৈচিত্র্য। বিশেষ করে তাঁর শেষের দিকে রচিত কাব্যে স্পষ্ট হয়ে ওঠে সাধারণের দৈনন্দিন জীবন। এই পর্বে ধরার চেষ্টা করেছি সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের জীবনের ও তাঁর সৃষ্ট কাব্যের এক বিশেষ পালাবদলকে।

এই পর্বে কবি নেমে এসেছেন সাধারণের দৈনন্দিন সংসারে। এই পর্বে কবির হাতে আর্তের তুচ্ছাতিতুচ্ছ বিষয় গল্পের ভঙ্গিতে তাঁর স্বতন্ত্র নির্মাণ চাতুর্য ও নির্মোহ মননশীলতায় অভিনব

শিল্পিতরূপ পেয়েছে। এই বৈশিষ্ট্যগুলি অপূর্ব আঙ্গিকে আটপৌরে মুখের ভাষায় রচিত 'যত দূরেই যাই' (১৯৬২ খ্রী:) কাব্য গ্রন্থে। এই পর্বেই দেখা যায় কবির ব্যক্তি জীবনের এক ট্র্যাজিক পরিণতি। কারণ কাব্য সৃষ্টি ও তাঁর দৃঢ় প্রত্যয়ের উৎস কমিউনিষ্ট পার্টি এ-সময় দ্বিধাবিভক্ত হয়ে যায় (১৯৬৪ খ্রী:) এই ঘটনা কবির মানসলোকে আলোড়ন ফেলেছিল। ফলে এই পর্বে কাল 'মধুমাস' (১৯৬৬ খ্রী:), 'এই ভাই' (১৯৭১ খ্রী:), 'ছেলে গেছে বনে' (১৯৭২ খ্রী:), 'জল সইতে' (১৯৮১ খ্রী:), 'চইচই-চইচই' (১৯৮৩ খ্রী:), 'বাঘ ডেকেছিল' (১৯৮৫ খ্রী:), 'যা রে কাগজের নৌকো' (১৯৮৯ খ্রী:), 'ধর্মের কল' (১৯৯১ খ্রী:) ইত্যাদি কাব্যে কবির আগের পর্বের প্রত্যয় ভিন্ন ভাষা, ভিন্ন আঙ্গিক, ও ভিন্ন কবিমানসে কাব্যরূপ নির্মিত হয়েছে। সুভাষ মুখোপাধ্যায় তাকে জীবন প্রতিষ্ঠার অস্ত্র হিসেবে কাব্যে শিল্পরূপ দান করেছেন। তাঁর কাছে কাব্য-শিল্প দামি কিন্তু, তার থেকে বেশী মূল্যবান মনে হয়েছিল জীবনের দাবি। তাঁর কবিতায় তিনি নিছক ভাবালুতাকে প্রশ্রয় দেন নি। কবিতায় বাড়তি বাগ্‌বহুলতাকে ঝরিয়ে ফেলে তাকে করতে চেয়েছিলেন মেদহীন, লঘু, নগ্ন, এবং সুঠাম। যথাসম্ভব যতিচিহ্ন বর্জন করেছিলেন, গ্রহণ করেছিলেন তির্যক ব্যঙ্গ, প্রবাদ ও ইডিয়মের ব্যবহার। গদ্যধর্মী আটপৌরে মুখের ভাষা, বৈচিত্র্যপূর্ণ হসন্ত, চরণের শেষে অন্ত্যমিল, অল্পকথায় গল্পের ভঙ্গী ও জীবনমুখী চিত্রকল্প, বিষয়, আঙ্গিক ও ভাববস্তুতে সুভাষ মুখোপাধ্যায় বাংলা কাব্যের ধারায় কতটা আধুনিক ছিলেন তা আমাদের বিচার্য বিষয়।

সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের ছড়াগুলিতে জীবন ও জগতের নানা অভিজ্ঞতা ছবির মতো বিশেষ আঙ্গিকে ফুটে উঠেছে। তাঁর ছড়াগুলিতে কাব্যের ভিন্ন স্বাদের পরিচয় পাই। চৌষট্টিটি ছড়া নিয়ে তাঁর একটি মাত্র ছড়ার বই 'মিউ-এর জন্যে ছড়ানো ছিটোনো' (১৯৮০ খ্রী:) ; ছড়ার ইতিহাসে এটি তাঁর বিস্ময়কর ও যুগান্তকারী সংযোজন। তাঁর রাজনৈতিক জীবনের সঙ্গে পৃথিবীর কী এমন আছে যার সঙ্গে তাঁর ভালোবাসা গড়ে ওঠে নি? ভাত, রুটি, খিচুড়ি, সিঙ্গারা, নিমকি, কচুরি, ছুঁচো, ইঁদুর, ব্যাঙ, মশা, মাছি, ভাম, সবরকমের পাখি, সবরকমের মানুষ, জল, মাটি, শহর, গ্রাম ইত্যাদি তুচ্ছাতিচ্ছ অনেক কিছু একই সুতোয় জীবনের সঙ্গে গেঁথে ফেলতে পেরেছিলেন তিনি। অনেক কিছু অনেক বড় কিছুও তাঁর কাছে অতি সাধারণ হয়ে তাঁর নিজের মতো করে ধরা দিয়েছে। এই ছড়াগুলিতে জগতের খুঁটি-নাটি অনেক কিছু বেছে নিয়েছেন, আর তার সঙ্গে জুড়ে দিয়েছেন এক একটি জুতসই পংক্তি। ছড়াগুলিতে প্রথম পংক্তির সঙ্গে পরের পংক্তির অর্থের দিক থেকে কোন মিল নেই, কিন্তু আছে চরণান্ত মিলের একই সুরে বেজে ওঠা আর শব্দ সাজানোর বিস্ময়কর দক্ষতার নিদর্শন।

বাংলা অনুবাদ কর্মেও তিনি ছিলেন অনন্যসাধারণ স্রষ্টা। তাঁকে কাব্য অনুবাদক হিসেবে আমরা পাই ভিন্ন এক কবি হিসেবে। অনুবাদের প্রভাবে যাঁর জীবন সম্পর্কে দৃষ্টি ভিন্ন রঙের ফুল ফুটিয়েছে। প্রধানতঃ নাজিম হিকমত, এছাড়া নিকোলো ভাপৎসারভ, পাবলো নেরুদা, ওলঝাস সুলেমেনভ হাফিজ প্রমুখ লেখকদের দ্বারা তিনি প্রভাবিত হয়েছিলেন। মূলতঃ নাজিম হিকমতের প্রভাবে তাঁর কবিতা হয়েছে অধিকতর জীবনমুখী। জীবনের সবকটি দিকই ফুটে ওঠে এই সময়কার কবিতায়। তাঁর অনুবাদ কাব্যে কতটুকু মূল্যের অনুগত তা যাচাই না করেই বলা যায়, সেগুলিতে তাঁর ব্যক্তিগত কবি প্রেরণা ও প্রতিভার ছাপ আছে। শব্দ চয়ন, ছন্দ বৈচিত্র্য ও প্রবন্ধে তাঁর প্রতিভার দীপ্তি আছে। তাঁর ব্যক্তিজীবন থেকে,সমাজ-জীবন ও জগৎ থেকে তিনি কী পেয়েছেন, আর জীবন ও জগতকে দেখার ভঙ্গিমাই বা তাঁর কী ছিল — সেটা অন্বেষণ আমাদের অন্যতম লক্ষ্য।